ATMADEEP
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-III, January, 2025, Page No. 649-659
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.03W.054

অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সংস্থান

উর্বী মুখোপাধ্যায়, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2025; Accepted: 25.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The special role of setting in the discussion of the novel can be seen from the beginning of the novel. Just as the discussion of how and in what order the story of a narrative will be organized belongs to the plot, so does the resource to clarify the geographical location of that story or event. The author places the characters of his story in a particular environment with respect to a particular period. We consider setting as 'text without story duration'. That is, as the presence of setting in the text can be direct or indirect, mobility or spatiality can also be the characteristics of resources. In fact, it all depends on the author's writing style and perspective. Setting in general refer to the natural geography of an area, its surrounding environment and climate. Not only the natural, but also the cultural geography of the region. Settings often play the role of symbols in narratives. Forests, seas, deserts, paths, flowers, even the light of the sunrise and the darkness of the sunset, replace their external meaning in the narrative with a search for a different meaning. In this essay we have tried to discuss the diversity of application of settings in some of Amiyabhushan Majumder's novels and its relevance in narrative with examples. Nature has always added a different dimension to Amiyabhushan's composition. His characters seem to have formed themselves by being united with nature. Amiyabhushan loved to paint, so the diversity of his use of color in describing setting is particularly noticeable.

Keyword: narrative, setting, character, symbol, novel.

উপন্যাস এমন একটি শিল্প মাধ্যম, যাকে সমালোচকেরা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে চলেছেন। সাহিত্যতত্ত্বের বিভিন্ন ধারায় চলে তার পর্যালোচনা – তেমনই একটি ধারা হল আখ্যানতত্ত্ব। উনিশ শতকের সূচনা থেকে উপন্যাস তত্ত্ব তার যাত্রাপথ শুরু করলেও, বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্বে এসে তা পূর্ণতা পায় ‘আখ্যানতত্ত্ব’ নামক প্রস্থানের মধ্যে দিয়ে। আখ্যানের তাত্ত্বিক কাঠামোটি গড়ে ওঠে প্রপ, বাখতিন, লেভি স্ট্রস, বার্ত, জেনেত, তোদোরভ, স্ট্যানজেল প্রমুখের হাত ধরে। এঁদের আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পায় আখ্যানের গঠন সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা। আখ্যান গঠনে প্রাধান্য পায় প্লট, সংস্থান, সময় ও চরিত্র। কোনো আখ্যানের কাহিনি কীভাবে, কী প্রণালীতে বিন্যস্ত হবে সে সংক্রান্ত আলোচনা যেমন প্লটের অন্তর্গত,

তেমনই সেই কাহিনি বা ঘটনার ভৌগোলিক অবস্থানকে স্পষ্ট করার দায়িত্ব সংস্থানের। লেখক তাঁর কাহিনির চরিত্রদের এক বিশেষ সময়কালের সাপেক্ষে এক বিশেষ প্রতিবেশে স্থাপন করে থাকেন। সংস্থান বর্ণনাকে আমরা ‘text without story duration’ হিসেবে ধরে থাকি। আখ্যানতত্ত্বে ‘setting’-এর বাংলা পরিভাষা করা হয় সংস্থান বা প্রতিবেশ। সাহিত্যে সংস্থান বলতে বোঝায় কাহিনি বা ঘটনাটি কোথায়, কখন সংঘটিত হচ্ছে অর্থাৎ কাহিনির স্থান ও কাল বিষয়ক আলোচনা করা হয় সংস্থানে। সংস্থান প্রধানত আখ্যানের অধিগঠনে বা সারফেস স্ট্রাকচারে প্রাধান্য পায়।

সংস্থান উপন্যাস ও নাটকে বিশেষভাবে প্রাধান্য পায়। আখ্যানে সংস্থানের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির মধ্যেই তার চরিত্ররা তাদের কল্পিত-জীবন যাপন করে। আখ্যানে সংস্থান দুটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। এক, আখ্যানে বস্তুগত বাস্তবের একটি স্পষ্ট পটভূমি নির্মাণ করে বাস্তবকে দৃঢ়তা দেয়। দুই, সংস্থান পাঠকৃতির ভাববস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে তাকে প্রতীকী অর্থ প্রদান করে। সংস্থান সংক্রান্ত আলোচনায় বলা যায়, আখ্যানের বিষয়গত বিন্যাসের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্থানও বদলে যায় “setting may be textually prominent or negligible, dynamic or static, consistent or inconsistent, vague or precise, presented in an ordinary fashion... or a disordinary one.” (Prince, 1982:73) অর্থাৎ পাঠকৃতিতে সংস্থানের উপস্থিতি যেমন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হতে পারে তেমনই গতিশীলতা বা স্থানুত্বও হতে পারে সংস্থানের বৈশিষ্ট্য। আখ্যানের বিষয়ের সঙ্গে তা যেমন সংগতিপূর্ণ হয়, কখনো আবার তাকে খাপছাড়া বলেও মনে হতে পারে। আসলে সবই নির্ভর করে লেখকের রচনাশৈলী তথা দৃষ্টিভঙ্গির উপরে। কেননা তিনিই ঠিক করেন, সংস্থানকে গুরুত্ব দেবেন কিনা, দিলে কখন কতটা দেবেন।

সার্বিকভাবে সংস্থান বলতে কোনো অঞ্চলের প্রাকৃতিক ভূগোল, তার চারপাশের পরিবেশ-পরিস্থিতি ও আবহাওয়াকে বোঝায়। শুধু প্রাকৃতিক নয়, অবধারিতভাবেই চলে আসে সেই অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ভূগোলের প্রসঙ্গও। আখ্যানের কথক বর্ণনার মধ্য দিয়ে সংস্থানের বিবরণ দিয়ে থাকেন। অবশ্য অনেক সময় চরিত্রের কথোপকথনের মধ্য থেকেও কোনো স্থান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আখ্যানে বর্ণিত চরিত্রের আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, জীবনধারণ পদ্ধতি অনেকাংশেই পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অরণ্য, পাহাড়, নদী, উপত্যকা অঞ্চল পৃথক পৃথক ভাবে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। তাদের জীবনের চাহিদা, সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশাও নিয়ন্ত্রিত হয় পরিবেশ দ্বারা। যেমন নদী বা সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার মানুষের জীবিকা হিসেবে প্রাধান্য পায় মাছ ধরা বা ফেরি পারাপার করার মত পেশা। আবার অরণ্য অঞ্চলের মানুষের জীবনে শিকার, বন্য ফল সংগ্রহ, গাছ কাটা প্রধান জীবিকা হয়ে ওঠে। আখ্যানে যে অঞ্চলের কথা বলা হয়, সে অঞ্চলের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, তাদের সার্বিক সংস্কৃতি, ধর্মবিশ্বাস এই সব কিছুই আবার সংস্থানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার অংশ হয়ে পড়ে। শরৎচন্দ্রের ‘পল্লীসমাজ’, কমলকুমারের ‘অন্তর্জলীযাত্রা’য় বিশেষ সময়ের প্রেক্ষাপটে গ্রাম বাংলার সমাজচিত্র উঠে এসেছে। আবার সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘ঢোঁড়াইচরিত মানস’এ কিংবা অমিয়ভূষণের ‘হলং মানসাই উপকথা’য় যোগাযোগের মাধ্যম স্বরূপ রাস্তা নির্মাণ, ব্রিজ তৈরি কিংবা ধানী জমির হাতছাড়া হওয়ার ফলে পেশা পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে মানুষের জীবনধারা।

সংস্থান অনেক সময় আখ্যানে প্রতীকের ভূমিকা পালন করে থাকে। অরণ্য, সমুদ্র, মরুভূমি, পথ, পুষ্পোদ্যান এমনকী সূর্যোদয়ের আলো আর সূর্যাস্তের অন্ধকারের বিবরণও আখ্যানে তার বাহ্যিক অর্থের পরিবর্তে এনে দেয় এক ভিন্নতর অর্থের সন্ধান। অমিয়ভূষণের ‘মহিষকুড়ার উপকথা’তে মানুষের অবচেতন

মনকে প্রতীকায়িত করে অরণ্য। বিভূতিভূষণের ‘আরণ্যক’এ দেখি দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্য কথক সত্যচরণের জন্য এক অপার সৌন্দর্য ও এক অজানাকে নিয়ে যেন অপেক্ষা করছিল। পথ দ্যোতিত করে গতিময়তাকে, যার কুশলী প্রয়োগ দেখি অভিজিৎ সেনের ‘রহু চণ্ডালের হাড়’এ। সুখী দাম্পত্য বা পারিবারিক ছবি ফুটিয়ে তুলতে সাজানো সুসজ্জিত বাগান এবং ব্যক্তিমানুষ তথা পরিবারের সার্বিক অসুখে সেই বাগানের শুকিয়ে যাওয়া, বিবর্ণ ও মলিন হয়ে যাওয়ার প্রতীক তো আমরা ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ থেকে ‘মালঞ্চ’এ বারবার দেখেছি। (মুখোপাধ্যায়, ২০১৫:১৪)

লেখক প্রধানত দৃশ্যপট নির্মাণের সাহায্যে কোনো অঞ্চলের সঙ্গে তার পাঠকের পরিচয় করিয়ে থাকেন। অর্থাৎ চিত্রকল্প নির্মাণ হল এক্ষেত্রে তার একমাত্র অবলম্বন। দৃশ্য নির্মাণের পাশাপাশি ইন্দ্রিয় নির্ভর অন্যান্য অনুভূতি অর্থাৎ শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও ঘ্রাণের সাহায্যও তিনি নিয়ে থাকেন তার রচনার সংস্থানকে বাস্তবায়িত করে তুলতে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নির্মিত সংস্থাকে লেখক জীবন্ত করে তুলতে চান, যার মধ্য দিয়ে রচনার প্রেক্ষাপট নামক জড় বস্তুটিও সজীব হয়ে ওঠে।

২

অমিয়ভূষণ তাঁর একাধিক উপন্যাসে সংস্থানকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর ‘মহিষকুড়ার উপকথা, ‘দুখিয়ার কুঠি, ‘বিনদনি’, ‘মাকচক হরিণ’, ‘হলং মানসাই উপকথা’ ও ‘সোঁদাল’ এর মত একাধিক উপন্যাসেরই পটভূমি হল উত্তরবঙ্গের দিগন্ত বিস্তৃত অরণ্যের কোলে লালিত ছোটো ছোটো গ্রাম। যেগুলো সভ্যতার স্পর্শে ক্রমে আধুনিক শহরের চেহারা নিতে শুরু করেছে। আমরা এই নিবন্ধে দেখব কীভাবে অমিয়ভূষণ তাঁর উপন্যাসে সংস্থান নির্মাণ করেছেন এবং তা ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে কতটা সাযুজ্যমণ্ডিত হতে পেরেছে।

‘মহিষকুড়ার উপকথা’, ‘দুখিয়ার কুঠি’ ও ‘হলং মানসাই উপকথা’ উপন্যাস তিনটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। অমিয়ভূষণ উপন্যাসের নামকরণেই আঞ্চলিকতাকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ‘মহিষকুড়ার উপকথা’ হল মহিষকুড়া নামক এক অঞ্চলের মানুষের কাহিনি। এ কাহিনি শুরু হয়েছে মহিষকুড়ার অতীত ইতিহাস দিয়ে এবং গ্রাম্যতাকে ত্যাগ করে মহিষকুড়া এগিয়ে গেছে যন্ত্রসভ্যতার দিকে। তাই এর নামকরণেও ‘উপকথা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ঠিক একইভাবে ইতিহাসের হাত ধরেই উত্তরের হলং ও মানসাই নদীর তীরের মানুষের জীবনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে ‘হলং মানসাই উপকথায়। অন্যত্র ‘কুঠি’ শব্দটাই প্রমাণ করে ‘দুখিয়ার কুঠি’র প্রাচীনতাকে, যাকে আশ্রয় করে বা বহন করে সেই গ্রামও পা বাড়িয়েছে আধুনিকতার দিকে।

তিনটি উপন্যাসের শুরুতেই ঔপন্যাসিক দীর্ঘ পরিসর ব্যয় করেছেন সংস্থান বর্ণনায়। ‘দুখিয়ার কুঠি’র সূচনাতে যদিও লেখক বলে দিয়েছেন যে, এই উপন্যাসের পটভূমি কাল্পনিক এবং তাকে বিশ্বস্ত করতেই আঞ্চলিক কথ্যভাষার ব্যবহার। কিন্তু উপন্যাস পড়তে পড়তে কখনোই মনে হয় না তার কাল্পনিকতার কথা। বরং তাকে অনেক বেশি বাস্তবিক মনে হয় – “ভূমিকায় এইটুকু বলা উচিত যে উপন্যাসটির সমস্ত ঘটনাই কল্পনাপ্রসূত। এমনকি কোনো বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলকেও পটভূমি হিসেবে নির্দিষ্ট করা উচিত হবে।” কিন্তু লেখক সচেতনভাবে যে প্রতিবেশকে উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তার কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল –

“মহকুমা সদর গদাধরপুর। শহরের লোকসংখ্যা পাঁচশো ছিয়াত্তর। ...

শহরের একখানা বাঁধানো পথের দৈর্ঘ্য আধ মাইল পরিমাণ। লাল সুরকি পথ বেমেরামতের ফলে ঝামা ও ইটের টুকরোয় খরখরে। ...
স্কুল নেই, চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই, কিন্তু বেশ্যালয় আছে। ...
ধুলো ধুলো ধুলো। বর্ষার দুমাস পর থেকে ধুলো শুরু হয়ে ক্রমশ সেটা বাড়তে থাকে। ... তারপর আসে বর্ষা। কাদা কাদা। ....
কেন এই শহর তৈরি হয়েছিল এ নিয়ে নানারকমের মত আছে। ...
তথাপি একটা শহর বিশ-ত্রিশ বছর ধরে টিকে গেলে আশা করা যায় হয়তো সেটা আরো কিছুদিন বেঁচে থাকবে।... গদাধরপুর তার যৌবনদশার দিকে এগোচ্ছে। এ ধরনের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে পিচ ঢালা পথ দিয়ে সদর মহকুমার সঙ্গে গদাধরপুরকে সংযুক্ত করার চেষ্টা...” (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ১৯-২০)

এরপরই লেখক দুখজাগানিয়ার কুঠি, যার চলতি নাম দুখিয়ার কুঠি ও তৎসংলগ্ন গদাধর নদীর নাম সংক্রান্ত কিছু তথ্য দিয়েছেন। সেইসঙ্গে দুখিয়ার কুঠির বেদনাবহুল অতীত ইতিহাসকেও সংস্থান হিসাবে তুলে ধরেছেন। এই উপন্যাসের চতুর্থ পরিচ্ছেদে লেখক পুনরায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন কীভাবে ধানজমির পাকা ফসলকে নষ্ট করে নতুন পিচের সড়ক সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। প্রথম পরিচ্ছেদে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত যে গদাধরপুরকে আমরা পাই, উপন্যাস যত অগ্রসর হয়েছে তার বর্ণনায় পরিবর্তন এসেছে। এখনকার গদাধরপুর আর আগের মত নেই। সভ্যতার অগ্রগতি যে গদাধরপুরের চেহারাতেও বদল এনেছে, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলছেন-

“ক্রেতা-বিক্রেতায় মিলে চারশো লোক জমা হতো। ...আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসত।
এখন সপ্তাহে দুদিন তো হাট হচ্ছেই, আর একদিন বসতে পারলে যেন ভালো হয়। ...
গোঁসাইদের দুটো দোকানের চেহারাই বদলে গেছে। ...হাটবার বলে কথা নয়, রোজই তাদের দোকানে শ্রমিকদের ভিড়। ...
নতুন দোকান উঠেছে একটি। ...মদ, গাঁজা ও আফিম বিক্রি হয়।” (দুখিয়ার কুঠি, পৃ.৪৯)

অরণ্য-প্রকৃতি অমিয়ভূষণের উপন্যাসে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা মূলত আদিবাসী হওয়ায় এবং উত্তরবঙ্গের অরণ্যবহুল অঞ্চলে বাস করায়, প্রকৃতি তাদের আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। অরণ্যকে বাদ দিয়ে তারা নিজেদের অস্তিত্বকে ভাবতে পারে না। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই সংস্থান হিসেবে অরণ্য-প্রকৃতির শান্ত-স্নিগ্ধ রূপ, তার ক্রূরতা, তার নৃশংসতা - সব কিছুই স্থান পেয়েছে উপন্যাসে। উপন্যাসের উনিশ পরিচ্ছেদে কাঁকরু ও মাতালু দুই বন্ধু তাদের মনের গভীর হতাশাকে দূর করতেই আশ্রয় নেয় অরণ্যের গভীরতায়। আর অরণ্যও যেন মাতালুর বেদনাকে আত্তীকৃত করে দুঃখী হয়ে ওঠে।

“মাতালু তার বাটুল নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু বলল, তাহলে কাঁকরকে একা যেতে দেবে না, সেও সঙ্গে যাবে।...
‘জঙ্গলৎ? কেনে তোর দুখ্ কী?’ ... ...
... যেহেতু মাতালুর মনে অশান্তি ছিল তা থেকে অনুমান হয়, সে হয়তো একটা কিছু অবলম্বন হিসেবে খুঁজছিল। আর অরণ্যের নিস্তব্ধতায় বোধ হয় শান্তির একটা রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; সে

রূপ আদিম হতে পারে, তবু মানুষের ইতিহাসে দেখা যায় সুদূর অতীত থেকেই অরণ্যস্তব্ধতার প্রতি তার একটা আকর্ষণ আছে।" (দুখিয়ার কুঠি, পৃ.৯৪)

পুনরায় –

"আকাশে আলো আর মেঘ, হলুদ আলো আর সাদা মেঘ। খুব ভালো করে দেখলে মেঘ যেখানে ভাঙচুর হয়ে সেখানে কখনো হালকা নীল, কখনো হালকা কমলা রং চোখে পড়তে পারে। এতক্ষণ নদীর ওপারের শহরের আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলছিল দিগন্তে। এখন তাও নেই। এ কী রকম নীরস, জীবনহীন, অপ্রয়োজনীয় আলো?" (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ৯৫)

"স্নিগ্ধ রাত্রিতে ভেজা ভেজা সবজে আলোতে শান্ত গাছগুলো বিশ্রাম করছে। আর তিনটি ঘর্মাক্ত মানুষ দুই দলে ভাগ হয়ে এক নির্বোধ খেলায় হিংস্র হয়ে উঠছে।" (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ৯৭)

"এক অদ্ভুত, অপ্রাকৃত ব্যাপারই যেন। এই আলোটা, এটা শেষ রাতের চাঁদের অথবা প্রথম সকালের সূর্যের তাও বোঝা যাচ্ছে না। ... বালি আর জল সমান চিকচিক করছে সেই অপার্থিব বিবর্ণ পাণ্ডুর আলোতে।" (দুখিয়ার কুঠি, পৃ. ১০০)

শান্ত, স্নিগ্ধ প্রকৃতি ক্রমে অপ্রকৃতস্থ হয়ে উঠতে শুরু করে। মানুষের অবস্থার বদলের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও যেন তার রূপ বদলে ফেলেছে। অমিয়ভূষণের এই গভীর নিরীক্ষণের প্রকাশ আমরা দেখি 'মহিষকুড়ার উপকথা' উপন্যাসেও। সেখানেও প্রকৃতি বা অরণ্য যেন মানুষের মনের অবচেতন অংশ। সে যেন মনের না-বলা অব্যক্ত কথা, অব্যক্ত বেদনার সাক্ষ্য বহন করছে সে। এই উপন্যাসের শুরুতেও লেখক দীর্ঘ অংশ জুড়ে মহিষকুড়া নামক গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান এবং মহিষকুড়া নামের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন।

"আমরা মহিষকুড়া গ্রামের কথাই বলছি, কিন্তু বনের কথা এসে গেল, কারণ বন থেকে এই সব গ্রামকে আলাদা করা যায় না।" ... ... "এই মহিষকুড়া, কিংবা ভৌটমারি, অথবা তুরুককাট গ্রামগুলোকে: তারা যেন বনের কোলে ঘুমায়, বনের বুকে খেলা করে, দুঃখে বনের বুকে মুখ রেখে কাঁদে।" (মহিষকুড়ার উপকথা, পৃ. ২৪০)

বন ও মানব-মনের যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, তাকেও লেখক সংস্থান বর্ণনার মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন–

"বনে ক্রীড়াশীল হরিণ-হরিণী যেমন আছে, তেমন, মুহূর্তে সে ক্রীড়াকে বিভীষিকায় পরিণত করে গ্রীবা কণ্ডূয়নের আদর আনত, তাকে তীক্ষ্ণ দাঁতে চিরে রক্তপান করে এমন বাঘও আছে, বাস-ট্রাকের শব্দে অপমানিত বোধ করে ডালপালা ভেঙে শুঁড় তুলে ছুটে চলা হাতীর দল আছে। ... অরণ্য সম্বন্ধে নানারকম কথা যে মনে হয়, ... তার কারণ বোধহয় এই যে, সে বরং অবচেতন মনের মতো। ... এসব মিলে যেন একটাই মন, বন যে মনের অবচেতন অংশ। আর তা যদি হয়, তবে মহিষকুড়ার মতো গ্রামগুলি অস্ফূট আবেগের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।" (মহিষকুড়ার উপকথা, পৃ. ২৪০)

আসফাকের জীবনে নারীসঙ্গ প্রথম আসে কমরুনের নৈকট্যে আসার দরুণ। প্রকৃতির কোলেই তাদের প্রথম পরিচয় ও মিলন। লেখক তাদের প্রথম মিলনের বর্ণনা করে বলেছেন –

"বিস্ময়ের মতো শোনালেও জন্মদরিদ্র আসফাক সেই প্রথম এক রত্ন দেখেছিল। নীলাভ বেগুনী রঙের মতো মেঘ-মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ-মেঘ মাথা। ... সেই নদী যেখানে সবুজে-নীল মেশানো, কখনও বা মোষ-রঙের পাথরের আড়ালে বাঁক নিয়েছে, সেখানে সকালের চকচকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে, ভরা জলে চকচকে মেয়েমানুষের শরীর। তা এখন শাড়ীতে ঢাকা আছে বটে। কিন্তু কী এক সর্বগ্রাসী মাধুর্য কমরুনের মুখে, তার কপালে, ... আধবোজা চোখদুটিতে, যার কোণে হাসি জড়ানো মনে হয়।" (মহিষকুড়ার উপকথা, পৃ. ২৬৯)

আবার 'হলং মানসাই উপকথা' উপন্যাসের প্রথমেই লেখক হলং ও মানসাই নদীর উৎস, তার প্রবাহ ও গতিপথের দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন। লেখক সংস্থান বর্ণনা করতে গিয়ে বারবার বলেছেন –

"আসল কথা, কি ভূগোল, কি ইতিহাস নিয়ে বেশ গোলমালই আছে।" (হলং মানসাই উপকথা, পৃ. ১৫)

কিংবা

"তাহলে তো ইতিহাস নয়, ভূগোল বদলায়।" (মাকচক হরিণ, পৃ. ২৫২)

সেই ভূগোল এবং ইতিহাস – দুইই পাশাপাশি স্থান করে নিয়েছে তাঁর সংস্থান বর্ণনায়। হলং ও মানসাই নদীর কাছাকাছি গ্রাম উখুণ্ডী, যার ভগ্নদশা থেকে শুরু করে ক্রমপরিবর্তমান রূপের বিবরণ দিয়েছেন বিস্তারিতভাবে। –

"দেখতে দেখতে সে গ্রাম শহর হয়ে ওঠার ঝোঁক নিয়ে বসল। কারণ একটাই, সড়কটা দিক বদলে হলং-এর দিকেই খানিকটা সরে এসেছিল, ...। দেখতে দেখতে গ্রামের চাষের জমিতে করাতকল, ধানকল, গম ভাঙানোর কলের চাকি বসে গেল; ছোট ছোট বয়লার তাদের। আর পরের পর ইলেকশন হতে থাকলে একটা স্কুল, পঞ্চায়েত অফিস, পুলিশের পাকাপোক্ত তাম্বু, একটা হেলথ সেন্টার।" (হলং মানসাই উপকথা, পৃ. ১৬-১৭)

সংস্থান বর্ণনার ক্ষেত্রে অমিয়ভূষণের এক বিশেষত্ব হল - তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্থির পটভূমি নির্মাণ করতেন না। প্রতিবেশ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি চলমান দৃশ্য নির্মাণের প্রতি তাঁর ঝোঁক বেশি। 'বিনদনি', 'মাকচক হরিণ' উপন্যাস দুটির পটভূমি একই স্থানের। রায়ডাকের তীরে শালবাড়ি অঞ্চলের তল্লিগুড়ি গ্রামের কাহিনিই বর্ণিত হয়েছে। 'বিনদনি' উপন্যাসে তল্লিগুড়ির যে পটভূমি তৈরি করা হয়েছে, 'মাকচক হরিণ' এ তার দু' বছর পরের পরিবর্তিত চেহারাকে পটভূমি হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। সংস্থান বর্ণনায় কিছু তফাৎ তাই লক্ষ করা যায়।

"সম্ভবত এই গাছজোড়া থেকেই গ্রামের নাম তল্লিগুড়ি। প্রধান গ্রামও ছিল বোধহয় – সে জন্যই গাঁয়ের দুপাশে লাগা আর দুটো গ্রামকে অন্দরম তল্লিগুড়ি ও বাহির তল্লিগুড়ি বলা হচ্ছে। ...এখন অবশ্য তল্লিগুড়ির কোনোদিকে কোনো প্রাধান্য নেই। বরং মরা-রায়ডাক আর রায়ডাকের মধ্যে বাহির তল্লিগুড়ি, যার পূর্ব অংশ দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে প্রায় রায়ডাক বরাবর, সেটা এত প্রধান যে তার নাম নগর রাখতে হয়েছে। প্রমোদনগর, শহর না হয়ে যায়!" (বিনদনি, পৃ. ৮৫)

অন্যত্র –

"গুড়ি এখন প্রধান গ্রাম নয়। বরং মরা-রায়ডাক আর রায়ডাকের মধ্যে বাহিরগুড়ি, যার পূর্বপ্রান্ত দিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে, সেটা এত প্রধান যে তার নাম নগর, প্রমোদনগর। পইলা পমোদনগর, তা

থাকি অ্যালা আমোদনগর। নগর নাম বলেই নয়। ... গত দু-বছরের মধ্যে আমোদনগরে পাকা দেওয়ালের বাড়িতে ক্লাস এইটের স্কুল।'' (মাকচক হরিণ, পৃ. ২৪৫)

পরিবর্তনের চেহারা হরিতলার বর্ণনাতেও ধরা পড়েছে। 'বিনদনি'তে হরিতলার বর্ণনায় পাই –

> ''হরিতলাতে আর একটা চায়ের দোকান চোখে পড়ল, আর যেখানে হরিতলা হাটতলায় মিশেছে, সেখানে বেশ কয়েকটি দোকান। ...একটির গায়ে ছোট একটা সাইনবোর্ডে 'রয়্যাল সেলুন' লেখা আছে। দোকানগুলিতে খড়ের ছাদ, বাঁশ-চাচাড়ির বেড়া। খুব নতুন নয়। ...তাহলেও পাঁচ বছর আগে হাটের দিন ছাড়া একটা দোকানও বসত না।'' (বিনদনি, পৃ.১১৩)

সেই হরিতলার বর্ণনা আরও দু'বছর পর পাই –

> ''...এখন পাকাপাকি হয়ে যাচ্ছে। আরও চায়ের দোকান। একটা জামাকাপড়ের দোকান। চায়ের দোকানের পাশে স্তুপাকারে চায়ের পাতা, ডিমের খোলা। ... হাটতলার মাঝামাঝি পথের ধারে আকরাম ছুটির দিনে একটা-দুটো খাসি-বকরি জবেহ করত। ভিড় লেগে যায় মাংস কিনতে।'' (মাকচক হরিণ, পৃ. ২৫০)

৩

অমিয়ভূষণ সংস্থান বর্ণনাকে শুধুই প্রকৃতির বিবরণ হিসেবে রেখে দিতে চাননি। তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা যেন প্রকৃতির কোলে বেড়ে ওঠা এক একটি জীবন্ত সত্তা। তিনি রাভা জনগোষ্ঠির কথা বলতে গিয়ে তাঁর 'বিনদনি' ও মাকচক হরিণ' উপন্যাসে এমন একটি বিষয়ের উপস্থাপনা করেছেন যার সঙ্গে প্রকৃতির একাত্ম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অমিয়ভূষণ রাভাদের মধ্যে প্রচলিত নানাবিধ সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে একটি বিশেষ প্রথার কথাও আলোচনা করেন – 'চিকাবাইরাই'। 'বিনদনি' উপন্যাসের শুরুতে লেখক চিকাবাইরাই প্রসঙ্গে বলেছেন –

> "অনেক ব্যাপার আছে, যার কারণ খুঁজে কোনোদিনই পাওয়া যায় না, অনেক মানুষ আছে, যার বীজের ঠিকানা শুধু মা-ই জানে।" (বিনদনি, পৃ.৮৬)

বীজের এই ঠিকানাই হল 'চিকাবাইরাই'। বুদিনাথের ভাষায় –

> "এটা এমন গোপন যা শুধু রাভা মেয়েরাই জানিতে পারে। রাভা মেয়েরা নিজের মিত্তুর আগে নিজের কন্যার কানে কয়া দেয়। অন্য কারো জানা দূরে থাক, নিজের স্বামী, ভাই, ছেলেকেও বলে না রাভা মেয়েরা। ... মানুষ, মানি রাভার আত্তা কোনো নদী, পাহাড়, ঝোরা-ঝন্না, বড় গাছ এসবকে অবলম্বন করিয়া মার শরীরে ঢুকে। মিত্তুর পর যেটে থাকি আসছিল, সেটে যায়। বাঁচি থাকিতে থাকিতে মানুষ ভুলি যায় কোটে থেকে আসছিল। সেজন্য মিত্তুর সময় বলি দেওয়া হয়, কী তার চিকাবাইরাই, কোনো শক্তিৎ তার জন্ম। কিন্তু গোপনে কানে কানে। চিকাবাইরাই শুনি আত্তা নিজের জায়গা ফিরি যায়।" (বিনদনি, পৃ.৯২)

অমিয়ভূষণ উপন্যাসে 'চিকাবাইরাই' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাভাদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী ছিল – গ্রামের বাইরের বড় বড় পাথরের চাঁইগুলো হল যুদ্ধে মারা যাওয়া রাভা মানুষের আত্মা। যুদ্ধের সময় কেউ তার আত্মার সদ্গতির কথা বলেনি – তাই তারা পাথর হয়ে গেছে। উপন্যাসে দেখি, শ্যামচাঁদের ঠাকুরদার 'চিকাবাইরাই' হল 'ললৎহাচু' অর্থাৎ ভাস্বর এক পাহাড়। বিন্দের আত্মা উজ্জ্বল ঝর্ণা

থেকে এসেছিল। তার ‘চিকাবাইরাই’ হল – ‘ললৎ চিকা’। রাভা পুরুষ এই অদৃশ্য আত্মাকে ভয় পায়। প্রত্যেক রাভার ‘চিকাবাইরাই’ থাকবেই।

যে অরণ্য সম্পদে একদিন অরণ্যচারী জনগোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার ছিল, তাকে খর্ব করেছে সভ্যসমাজের মানুষেরা। ফলে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনকারী অরণ্যের আদি বাসিন্দারা ক্রমে পরিণত হয়েছে শ্রেণি-চরিত্রে – খেটে খাওয়া মজুরদের। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেও, অরণ্যের কাছে ফিরে যাওয়ার কোনও পথ নেই, কেননা আসফাকের মতো আজ অনেকেই জানে –

> “তা আসফাক এই পৃথিমিতে যত জমি দেখ, তা সবই কোনো-না কোনো জাফরের। ... বন তো শুনি এক মালিকের। তা তুমি যত দূরে যেখানে যাও বনে ডাক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবে সেই বনও, যাকে তুমি নতুন মনে কর, তাও সেই মালিকের।”(ম.কু.উ. পৃ.৫০)

আসফাক, মাতালুর মতো রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষেরাও অরণ্যের সঙ্গে আত্মার যোগ অনুভব করত। রাভা গ্রাম গড়েই উঠেছিল অরণ্যকে কেন্দ্র করে। রাভা পুরুষের সত্তার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে অরণ্য। অমিয়ভূষণ এই সত্যতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন কীভাবে অরণ্যের বিলুপ্তি রাভা জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনে সংকটকে ঘনীভূত করেছিল। রাভা সমাজ-সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল অরণ্য। রাভা জমিতে মেয়েরা চাষ দেবার পর, শিকার ছাড়া রাভা পুরুষের আর কোনও কাজই থাকে না। শিকারেই পুরুষের পৌরুষত্ব। রাভা জমিকে বন্য পশুর হাত থেকে রক্ষা করাও ছিল রাভা পুরুষের কাজ –

> “কী করবে, কেন, তোমরা রাভার বেটা? রাভার বেটির নয় তো ধানখেত থাকিল্। হাঁতি আইসে, রুখিবে? ভৈষী ঢোকে ধানখেতৎ, পেনটি ধরি টানো? বুনা শুয়োর আইসে ধানবাড়ি? বন কোটে?”
> (সৌদাল, পৃ.৮২)

মোন্নাত, মলগুঁ উভয়েই জানে বন্য শুয়োর, হাতি, মোষ কোনও বন্যজন্তুই আর রাভা জমিতে ধান খেতে আসে না। কারণ দিগন্তবিস্তৃত সুগভীর অরণ্য আর নেই। কাঁটাতারের বেড়ায় সে আবদ্ধ। আর বন না থাকলে রাভা পুরুষের কোনও কাজই অবশিষ্ট থাকে না। ‘রিজার্ভ ফরেস্ট’-এ অনুমতি লাগে প্রবেশ করতে, শিকার করা তো দূরস্ত। এছাড়াও রাভা স্ত্রীর মৃত্যু হলে রাভা পুরুষেরা শ্বশুরবাড়িতে থাকে না। কারণ রাভা নারী মারা গেলে পুরুষ জমিহারা হয়, তার তখন থাকে শুধু – ‘বন’ ও ‘দাও’ (দাঁ)। তাই জনের মায়ের মৃত্যুর পর তার পিতা বনে চলে গিয়েছিল বনসাহেবের চাকরি নিয়ে, নতুবা তার বনে প্রবেশের কোনও অধিকার নেই। তবুও রাভা পুরুষের অন্তর বারবার ধাবিত হয় অরণ্যের দিকে। যেমনটা হয়েছিল জন ও বোমভোলার। ডাকহরকরা বোমভোলা ছুটি পেলেই ছুটে যায় বনে – চৈ, মেটে আলু সংগ্রহের অজুহাতে। হয়তো কখনও বনে কোনও বন্য জন্তুও সে পেয়ে যায়।

অমিয়ভূষণ রাভা পুরুষের অন্তরের দ্বিধাময়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন অরণ্য ছাড়া রাভা পুরুষের অস্তিত্বও বিপন্ন। তারা ক্রমেই আশ্রয়হীন হয়ে পড়ছে। একদিকে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিবর্তন এবং অন্যদিকে প্রগতিশীল মানুষের অরণ্যের উপর অধিকার – এ দুইই যেন রাভা পুরুষকে দিশেহারা করে তুলেছে। তারই অপর উদাহরণ ‘বিনদনি’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র জন। সে একসময় স্ত্রীর মৃত্যুর পর আসামে চলে যায়, কারণ বনে প্রবেশের অনুমতি তার ছিল না। কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছর পর গ্রামে ফিরে সে যখন তার শাশুড়ির জমি রক্ষার তাগিদে সরকারী কর্মচারীকে খুন করে তখন সে শেষবারের মতো

বনের কোলে আশ্রয় নিতে চায়। যে বিনদনি তার শাশুড়ি, যাকে সে একদিন 'কিলাংনানি' প্রথার আশ্রয় নিয়ে স্ত্রী হবার জন্য অনুরোধ করেছিল, সেই বিনদনির কাছে তার করুণ আর্তি শোনা যায় -

> "চলো পালাং, চলো। ...সে বিনদনির হাঁটুতে মুখ রাখল, আচ্ছা, আচ্ছা, নো-হয়ত আমার মাও হন। মাও হয়া বনৎ চলেন।" (বিনদনি, পৃ.১৪৭)

অমিয়ভূষণ জন, বোমভোলা, আসফাক-এর অরণ্যের প্রতি এই তীব্র আকর্ষণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, -

> "কবিতা করে বলতে, বনের টান রক্তে, নাকি বিজ্ঞান করে বলতে ডি-এন-এ'র অসন্তোষ?"
> (বিনদনি, পৃ.১৩৫)

৪

সংস্থান বর্ণনায় উপন্যাসগুলোতে বিভিন্ন স্থানের ব্যবহার করা হয়েছে। তার মধ্যে অধিকাংশ স্থানই ভৌগোলিকভাবে বাস্তবসম্মত। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার বিভিন্ন স্থান তাঁর উপন্যাসে পটভূমি হিসেবে এসছে। রায়ডাক নদী, মানসাই নদীর কথা আমরা পাই উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসেও। উপন্যাসগুলির সংস্থান হিসেবে এসেছে গ্রাম-জীবন। গ্রামজীবনের সঙ্গে যুক্ত নানান প্রসঙ্গ যেমন - কৃষিকাজ, বাথান, হাট-বাজার, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার কথা এসেছে। গ্রামজীবন থেকে ক্রমে যন্ত্রসভ্যতার দিকে ধাবিত হয়েছে পটভূমি। যন্ত্রসভ্যতার অনুষঙ্গ হিসেবে এসেছে - কলকারখানা, রাস্তা তৈরি, ব্রিজ তৈরি, ইটভাটার প্রসঙ্গ। আছে স্কুল, কলেজ-এর কথা, ভোট, হাসপাতালের প্রসঙ্গও এসেছে, যা সংস্থানকে বিশ্বস্ত করেছে। নিচে একটা সারণীর সাহায্যে দেখা যাক কোন উপন্যাসে কোন সংস্থান কীভাবে এসেছে।

উপন্যাস	প্রতিবেশ	স্থান নাম	গ্রাম্য অনুষঙ্গ	অরণ্যের অনুষঙ্গ	আধুনিক সভ্যতার অনুষঙ্গ
মাকচক হরিণ	গ্রাম ও শহর	প্রমোদনগর (বাহিরগুড়ি), সেরফাংগুড়ি,মেচপড়, তল্লিগুড়ি, বুড়ির হাট, মহকুমা সদর, গান্ধীনগর, সোনামালা, গৌহাটি (আসাম)	পঞ্চায়েত প্রথা, পঞ্চায়েত অফিস আধিয়ার,বর্গাদার ধানজমি, টিউবওয়েল	শালবন	ডাক ব্যবস্থা, ইলেকট্রিক, ন্যাশনাল হাইওয়ে, পাকা বাড়ি, মাধ্যমিক স্কুল, জলের মেশিন
হলং মানসাই উপকথা	নদী, গ্রাম, শহর, বন	হলং ও মানসাই নদী মনসাইঘাট, হলং বন, উখুণ্ডি গ্রাম, ফালাকাটা, ধুপগুড়ি শহর, আসাম, শালবাড়ি, পলাশবাড়ি	হেলথ সেন্টার (ডাক্তার, নার্স, কম্পাউন্ডার)	বন, বাঘিনী	ভোট ব্যবস্থা, ড্রামাটিক ক্লাব, ফ্যাক্টরি

সোঁদাল	বনশহর ,	মরুচমতী (নদী), তুরুককাটা (শহর), ডাউকিমারি (ব্লক), হাতকাটা, হাদলমারি, লাউতামা	-	রিজার্ভ ফরেস্ট, সোঁদাল গাছ, শটী বন, পানি কচু, শোল কচুর খেত	ভোট, ইলেকট্রিসিটি, হাইস্কুল, কলেজ, সমাজভিত্তিক বনসৃজন, ইটভাটা, অফিস, রাইফেল
মহিষকুড়ার উপকথা	গ্রাম ও অরণ্য	মহিষকুড়া গ্রাম, সলসলা বাড়ি [কোচবিহার শহরের কাছাকাছি] তুরুককাটা, ভোটমারি, শালবাড়ি-র নাম এসেছে	মোষের বাথান, তামাক খেত, ধান খেত, গরু গাড়ি, পঞ্চায়েত প্রথা, খামার বাড়ি, হাট, ধান মাড়াইয়ের জায়গা	বন্যপথ, বন্যমহিষ, বাইসন, গভীর জঙ্গল, যাযাবর জীবন শালের জঙ্গল, চৈ, খরগোশ, বনমোরগ	কোর্ট, রেডিও, ট্রাক, বাস
দুখিয়ার কুঠি	গ্রাম, শহর, অরণ্য ও নদী	গদাধরপুর (মহকুমা সদর), দুখিয়ার কুঠি (গ্রাম), গদাধর (নদী), রাজধানী (কোচবিহার)-এর উল্লেখ আছে	নদীতে সাঁকো, ধানখেত, গোয়ালঘর, হাট, কাদা-ধুলো	নদীর ধারে জঙ্গল, জঙ্গলে বরা শিকার, নামহীন ঘন জঙ্গল, চোরাবালিতে ভর্তি	কোর্ট, পাকা সড়ক, ব্রিজ নির্মাণ, আফিম, মদের দোকান, ট্রাক, গ্রামোফোন, একসাইজ বিভাগ
বিনদনি	গ্রাম, শহর, নদী, বন	তল্লিগুড়ি (বাহির ও অন্দর), বাহির তল্লিগুড়ি বা প্রমোদনগর (শহর), মিশন হাউস (গোপালনগর), এছাড়া কলিগুড়ি, শালবাড়ি, মাকালগুড়ি, বুড়ির হাট-এর নাম আছে। কামাগুড়ি, বারুহাট, নদী-রায়ডাক, মরা রায়ডাক, বুড়া-রায়ডাক	হাট, হরিঘর, চাষের খেত, প্রাথমিক স্কুল, গোয়ালঘর, খড়ের গাদা, মাটির বাড়ি	বুড়া রায়ডাকের পাড়ে খণ্ড শালবন, মাটিয়া আলু, চৈ, বন্য শুয়ার, বাইসন	ন্যাশনাল হাইওয়ে, ডাকবাহক, রেডিও, আদালত, থানা, পুলিশ, ট্রাক, বনসাহেব, রাইফেল

তথ্যসূত্র:

1) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, দুখিয়ার কুঠি, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' (৩য় খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫।
2) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মহিষকুড়ার উপকথা, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' (৬ষ্ঠ খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮।
3) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, বিনদনি, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' (৭ম খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৯।
4) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, হলং মানসাই উপকথা, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' (৮ম খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।
5) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, সোঁদাল, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' (৮ম খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।
6) মজুমদার, অমিয়ভূষণ, মাকচক হরিণ, 'অমিয়ভূষণ রচনাসমগ্র' (৮ম খণ্ড), দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০।
7) মুখোপাধ্যায়, উর্বী ও চট্টোপাধ্যায়, অনুনয় (সম্পা), 'বাংলা সাহিত্যে সমুদ্র', দে'জ পাবলিশিং,। কলকাতা, ২০১৫।
8) Bal, Mieke, 'Narratology: Introduction to the Theory of Narrative', University of Taranto Press, London, 1999.
9) Chatman, Seymour, Story and Discourse, Cornell University press. London, 1980.
10) Prince, Gerald, Narratology, Mouton Publication, New York, 1982.